ভাষণ

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা

প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণা

[গত ২৯ এপ্রিল, ২০১০ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলেন শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সহ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণা। তাঁর ইংরেজি ভাষণটির অনুবাদ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল। আশা করি সারগর্ভ রচনাটি পাঠক-পাঠিকাদের আনন্দ দেবে।—সঃ]

শিক্ষার ইংরেজি শব্দ 'এডুকেশন'। এই শব্দের উদ্ভব ল্যাটিন ভাষার 'এডিকিওর' ধাতু থেকে, যার অর্থ ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে আসা। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার সঙ্গে এর সাদৃশ্য বিস্ময়কর। স্বামীজীর মতে শিক্ষা হল মানবের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ।

ইতিহাসের পাতা উলটে ছ-হাজার বছর আগেকার ভারতবর্ষের একটি চিত্র মানসনেত্রে দেখব। ভারত তখন ঘনসবুজ অরণ্যে ভরা। সেই অরণ্য শুধুমাত্র হিংস্রপশুদের বাসভূমি ছিল না; সেখানে ছিল ঋষিমুনিদের বিখ্যাত তপস্থলী এবং আশ্রম। সেসব আশ্রমে যাঁরা শিক্ষাদান করতেন তাঁদের 'আচার্য' বলে সম্মানিত করা হত। যেসব ছাত্র আচার্যদের সঙ্গে থেকে শিক্ষাগ্রহণ করত, তারা আচার্যের স্নেহচ্ছায়ায় বড়ো হয়ে উঠত। সেইসব আচার্য ছাত্রদের নীতিশিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না; তাঁরা নিজেরাই এক একটি প্রতিষ্ঠান ছিলেন। ছাত্রেরা একটি বৃহৎ পরিবারের অঙ্গ হয়ে বিভিন্ন কাজকর্ম করত। সেখানে আলস্যের কোনও স্থান ছিল না, পরিশ্রম তাদের অনুশাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমাদের পুরোনো পুঁথিপত্রে এমন আচার্য ও শিষ্যদের কত গল্প আছে!

সেইসময় একটি বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে অরণ্য মুখরিত হত : আ মা যন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা, বি মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা, প্র মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা, দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা, শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা (তৈত্তিরীয়োপনিষদ, ১।৪।২)। এই মন্ত্রে ঋষি প্রার্থনা করছেন—চতুর্দিক থেকে যোগ্য, শান্ত, আত্মনিয়ন্ত্রিত ও বুদ্ধিমান ব্রহ্মচারিগণ আসুক। জ্ঞানপিপাসুদের জন্য বৈদিক ঋষিদের আকূতিও এই মন্ত্রে আমরা দেখতে পাই। যে আচার্যগণ ছাত্রদের অন্তরে জ্ঞানের আলো জ্বালাতেন তাঁদের ও ছাত্রদের মধ্যে বিদ্যার স্বাভাবিক পবিত্র আদানপ্রদান চলত। অত্যুচ্চ চিন্তাগুলি খোলাখুলিভাবে আলোচিত হত। এই জ্ঞানরাজি ভবিষ্যৎপ্রজন্মের জন্যই সঞ্চিত থাকত, আর এক্ষেত্রে অর্থসম্বন্ধের নামগন্ধও ছিল না।

আর্যেরা সুপুরুষ এবং দীর্ঘকায় ছিলেন। যোগসাধনের মাধ্যমে ব্যায়াম ও শরীরচর্চা করা তাঁদের দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যে পড়ত। আর্যমন উচ্চভূমিতে বিচরণ করলেও তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল সহজ, একমুখী। আচার্য এবং শিষ্যগণ একত্রে প্রার্থনা করতেন : ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু। সহবীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। —''(ব্রহ্ম) আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন, উভয়কে তুল্যভাবে বিদ্যাফল দান করুন, আমরা যেন সমভাবে সামর্থ্য অর্জন করতে পারি, আমাদের উভয়ের লব্ধ বিদ্যা সফল হোক, আমরা যেন

পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।" এই বৈদিকমন্ত্রের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি যে আচার্য ও শিষ্যের মধ্যে মাঝেমাঝে মতান্তর ও বিতর্ক চলত। কিন্তু সেটি কখনও খুঁত ধরার বা ঈর্ষার পর্যায়ে পৌঁছায়নি। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা বিদ্যার্থীকে আদেশ করেন : প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া—জ্ঞান অর্জন করবে আচার্যের নিকট প্রশ্ন করে; তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং তাঁর সেবা করবে। এটি প্রমাণ করে যে ছাত্রদের আভ্যন্তরীণ বিকাশের জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হত। আজকের আবাসিক ছাত্রাবাসের সঙ্গে আশ্রমের অনেক তফাত ছিল। ছাত্রদের সবরকম গৃহস্থালির কাজ করতে হত কেন-না আচার্যেরা বুদ্ধি এবং হৃদয় উভয়েরই সমান বিকাশ চাইতেন। কেবল পড়াশোনা করলে ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হতে পারে না। একটি আদর্শ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য হৃদয় ও বুদ্ধি একসঙ্গে বিকশিত হতে হবে। তার জন্য ছাত্রদের পরিশ্রম করে সক্ষম হতে হবে, তার সঙ্গে যুক্ত হবে দৃঢ়চরিত্র। শাস্ত্রপাঠ এবং বৈদিকমন্ত্রপাঠ ছাড়া তাদের শিক্ষার বিষয় ছিল ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও গণিত। তারা চিকিৎসাবিদ্যা এবং অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হতে পারত। গবেষণা চলত রসায়নবিদ্যা, জলসেচন, যন্ত্রবিদ্যা (ইঞ্জিনিয়ারিং), জাহাজনির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

বৈদিকযুগে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনও বৈষম্য ছিল না। ঋগ্‌বেদে সাতাশ জন নারী-ঋষির উল্লেখ থেকে বোঝা যায় সত্যের অন্বেষণে উভয়েরই সমান অধিকারে তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন। জ্ঞান সকলেরই সম্পদ ছিল। তাই সেসময় আমরা গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং বাক্‌-এর মতো প্রখরবুদ্ধিসম্পন্না এবং আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত মহীয়সী নারীদের দেখতে পাই।

ছাত্রজীবনে অপরিহার্য ছিল মনের একাগ্রতা ও ব্রহ্মচর্য। বিলাসিতা, যা মনের উৎসাহকে ঘুম-পাড়িয়ে দেয়, তা থেকে তারা বহু দূরে ছিল। ছাত্রজীবনের শেষে ছাত্রকে বিশেষ সুগন্ধিস্নান করানো হত বিদ্যায় সমৃদ্ধ মানবের নবজন্ম ইঙ্গিত করতে। 'স্নাতক' শব্দের উৎপত্তি এই রীতি থেকে। আশ্রমের গণ্ডি পেরিয়ে বিশাল পৃথিবীতে যাওয়ার আগে সমাবর্তনের পরে ছাত্রদের আচার্য শপথ করাতেন : সত্যং বদ—সত্য কথা বলবে; ধর্মং চর—ধর্মপথে চলবে; স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ—বিদ্যার প্রতি বিমুখ হোয়ো না ইত্যাদি।

কালস্রোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানবদ্ধ হল। মহাভারতে আমরা নৈমিষারণ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখ পাই যেখানে উপযুক্ত আচার্যদের কাছে দশহাজার ছাত্র অধ্যয়ন করত। শৌনক ঋষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, তাঁর উপাধি ছিল 'কুলপতি'। বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অগ্নিস্থান, ব্রহ্মস্থান, বিষ্ণুস্থান, মহেন্দ্রস্থান' ইত্যাদি অনেক বিভাগ ছিল। কঠিন অনুশাসনের মধ্যে ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করত। ভারতে শিক্ষা কখনও ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি। জনক এবং বহু রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তর্কসভা এবং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। তক্ষশীলা, নালন্দা প্রভৃতি আরও অনেক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল যাদের প্রভাব দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এসব তত্ত্ব প্রমাণ করে যে বৈদিকযুগ থেকে ভারত ছিল একটি জ্ঞাননির্ভর সভ্যতা। সমাজে জ্ঞানিজনেরই কদর বেশি ছিল। মাননীয় ড. আব্দুল কালাম বলেছেন যে প্রতিটি সভ্যতাকে চারটি ধাপ পেরোতে হয়, শেষ ধাপ হল 'জ্ঞানের সভ্যতা'। কয়েকবছর আগে পাকিস্তানের নোবেল-পুরস্কৃত বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম তাঁর অধ্যাপকদের সঙ্গে দেখা করতে কলকাতায় আসেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করা হয়। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ভারতের ঐতিহ্য জ্ঞানের ঐতিহ্য, তাই তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে জ্ঞানীদের সর্বদা সম্মান দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় গবেষণার উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব

মার্ক টোয়াইনের সেই কথাটি মনে পড়ে : ''ভারত হল মানবসভ্যতার শৈশব, ইতিহাসের জননী, উপাখ্যানের পিতামহী, ঐতিহ্যের প্রপিতামহী। মানব-ইতিহাসের মূল্যবান এবং শিক্ষাপ্রদ তত্ত্বগুলি শুধুমাত্র ভারতেই রক্ষা করা হয়েছে।" প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানসাধনার কিছু কৃতিত্ব এখানে উপস্থাপিত হল।

জ্যোতির্বিদ্যা : এইবিষয়ে ঋগ্‌বেদে দেখতে পাই :

১। সৌরজগতের সকল বস্তু উপবৃত্তাকার পথে

পরিভ্রমণ করে (ঋগ্‌বেদ, ১।১৬৪।১)। পৃথিবী গোলাকার এবং সে তার নিজের অক্ষের চারদিকে এবং সূর্যের চারদিকে পরিভ্রমণ করে।

২। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। সে তার মাতৃগ্রহ পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করে; এবং পৃথিবী পিতৃগ্রহ সূর্যকে পরিভ্রমণ করে। (তদেব, ১০।১৮৯।১)

যুদ্ধশাস্ত্র : ড. আব্দুল কালাম 'নাসা' পরিদর্শনের সময় অভ্যর্থনাকক্ষে একটি পুরোনো চিত্র দেখতে পান। একটি সৈন্যের অপরপক্ষের ওপর রকেট ফেলার দৃশ্য সেই চিত্রে সুন্দরভাবে অঙ্কিত ছিল। কর্মচারী বললেন যে সেটি টিপু সুলতান এবং ব্রিটিশ সৈন্যের যুদ্ধের ছবি। টিপুর সৈন্যদের কাছ থেকে রকেট তৈরির কৌশল জেনে ইওরোপে পাঠানো হয়। তারপর রকেটকে অস্ত্র করে যুদ্ধে প্রয়োগ করার গবেষণা বিদেশে শুরু হয়। ড. কালাম ব্রিটিশ গ্রন্থাগারে গিয়ে এই তত্ত্বের প্রমাণ পান। আজ তাই টিপু সুলতানকে রকেট-ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পিতা বলা হয়। হয়তো রকেটের জন্ম আরও আগে। রামায়ণ ও মহাভারতের সময় থেকে 'আগ্নেয়াস্ত্রে'র উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা ভোজ দশম শতাব্দীতেই এইসব অস্ত্রের বর্ণনা তাঁর বইতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

কৃষি : প্রাচীন ভারতবাসী মাটির তলায় জলের অনুসন্ধানে পারদর্শী ছিলেন। বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা' এক্ষেত্রে এতটাই বিখ্যাত যে আজও মাটির গর্ভে নলকূপ খননের আগে বিজ্ঞানীরা তাঁর পরামর্শ মেনে চলেন।

জীববিজ্ঞান: বৈদিকযুগে আর্যেরা সালোকসংশ্লেষ (ফোটোসিনথেসিস) সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। টাক্সোনমি, মাটি এবং বীজ নির্বাচন, বীজ বপন ও অঙ্কুরিত করা, কলম লাগানো, ঘুরিয়ে চাষ করা ইত্যাদি অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া যায় অগ্নিপুরাণে।

ক্যালেন্ডার: খ্রিস্টের জন্মের বহু সহস্র বছর পূর্বে ভারতীয় ক্যালেন্ডার পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছিল। আশ্চর্য লাগে যে, সময়ের পরিমাপের প্রতিটি একক সংস্কৃত শব্দ থেকে উদ্ভূত যেমন দিবস থেকে 'ডে', হর থেকে 'আওয়ার' এবং অয়ন থেকে 'ইয়ার'।

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা: ভারতবাসীরা তামা, দস্তা, লোহার সালফেট যৌগ এবং সীসা ও লোহার কার্বনেট যৌগ তৈরি করতে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারতেন। চুল্লি দিয়ে অপরিষ্কৃত ধাতু গলিয়ে উন্নতমানের ইস্পাত তৈরি করতেন। প্রাচীন ভারতীয়রা সূর্যের নাম দেন 'সপ্তাশ্ব', 'সপ্তহরি' ইত্যাদি—সূর্যরশ্মি সাতটি বর্ণের সমষ্টি বলে।

গণিত: প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন স্বীকার করেছেন যে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির উন্নতিকার্যে ভারতের উল্লেখযোগ্য অবদান ছাড়া কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হত না। অখণ্ড সংখ্যার বর্গমূল ও ঘনমূল আবিষ্কারের পদ্ধতিতে আর্যভট্টের অবদান উল্লেখযোগ্য। সরল দ্বিঘাত সমীকরণ এবং ত্রিকোণমিতি তাঁদের জানা ছিল।

চিকিৎসা: আয়ুর্বেদের বীজ দেখা যায় অথর্ববেদে। লিউকোডারমা, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, জন্ডিস ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা এবং দন্তচিকিৎসা আয়ুর্বেদ চিকিৎসকেরা করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ইংরেজরা জানতে পারেন যে ভারতীয় চিকিৎসকেরা অনায়াসে প্লাস্টিক সার্জারি করতেন। কোনও কোনও গ্রন্থে চোখের মণি পরিবর্তনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়!

ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির উল্লেখযোগ্য দিক

মনের নিয়ন্ত্রণ : ভারতের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ অবদান মনের নিয়ন্ত্রণ বা একাগ্রতার শিক্ষা। গুরুকুলে এই শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হত। নিয়ন্ত্রিত মন অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটাতে পারে! যার আধুনিক উদাহরণ : বিশ্বকোষের মতো বিরাট গ্রন্থগুলি স্বামী বিবেকানন্দ একদিনে আয়ত্ত করতে পারতেন! আমরা বই পড়ি বাক্য ধরে, কিন্তু তিনি পড়তেন পৃষ্ঠা ধরে! ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির মূল লক্ষ্য ছিল মনের উন্নতি এবং চরিত্রগঠন। ছাত্রদের এই ছাঁচে ঢেলে তৈরি করার জন্য প্রয়োজন ছিল মূল্যবোধ শিক্ষার।

শিক্ষায় মূল্যবোধ : মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মিটে গেলেই সে সূক্ষ্মতর উন্নতিলাভের চেষ্টা করে। পাশ্চাত্যে সততা, সত্য এবং সৌন্দর্য ইত্যাদিকে শ্রেষ্ঠ

বলে মূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা এই মূল্যবোধগুলিকে অতিক্রম করে সর্বোচ্চ সত্যকে ধরতে কোনওদিন চেষ্টা করেননি। ভারতের ঋষিগণ সেই সত্যের অনুসন্ধানে ব্রতী ছিলেন। তাঁরা আবিষ্কার করলেন সব মূল্যবোধের উৎস সেই সৎ-চিৎ-আনন্দ, যার প্রাপ্তি মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য পূরণ করে। সচ্চিদানন্দই আমাদের স্বরূপ। মানবের প্রকৃতি এই সত্যকে পাওয়ার জন্য প্রেরণা জোগায়। একেই আমরা বলি বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ। এই শ্রেষ্ঠ সত্যের ভিত্তিতে ভারতীয় সংস্কৃতির কালজয়ী মূল্যবোধ অবস্থিত। এর উপসংহার হিসেবে সততা, সত্য, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা, নিঃস্বার্থপরতা এবং সেবা যুক্ত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রশ্ন তুলেছেন : ''প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করিতেছে যে, সকল নীতিতত্ত্বের সার—অন্যের হিতসাধন। কেন অপরের হিতসাধন করিব? সকল ধর্মই উপদেশ দিতেছে—নিঃস্বার্থ হও। কেন নিঃস্বার্থ হইব?'' এই মূলপ্রশ্নের উত্তর কেউ দেয় না। একমাত্র অদ্বৈততত্ত্ব এর উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছে। স্বামীজী বলছেন : ''অপরকে হিংসা করিলে নিজেকে হিংসা করা হয়। তুমি জানো বা না জানো... সকলেই যে তুমি! এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হও।''

তাই ছাত্রদের শেখাতে হবে—সৎ হতে হবে সমাজের বা পুলিশের ভয়ে নয়, সেটি আমাদের স্বরূপ বলে। বস্তুত সৎ-চিৎ-আনন্দ আমাদের স্বরূপ হওয়ায় ওইগুলির স্ফুরণ স্বাভাবিক, যথার্থ আত্মবিকাশ তখনই হবে যখন নিজের ও সমাজের কল্যাণের পথে ওইগুলি পরিচালিত হবে। তা না হলে মূল্যবোধ শুধুমাত্র সামাজিক নীতি বা সাধারণ প্রথা হয়ে থাকবে। সত্যের ভিত্তিতে যে মূল্যবোধগুলি প্রতিষ্ঠিত, তারা দৃঢ়চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। মহাত্মা গান্ধীর জীবন অহিংসা ও সত্যের উজ্জ্বল উদাহরণ। চরিত্রের বিস্ময়কর শক্তির বলে তিনি ভারত ইতিহাসকে গড়ে তুলেছিলেন।

বিশ্বকে ভারতের উপহার মূল্যবোধের ধারণা। ভারতবর্ষ বুঝেছিল যে মূল্যবোধ এবং নীতির উৎস আধ্যাত্মিকতা। তাই অনেক নীতিতত্ত্ব সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম সোপান 'যম'কে বর্ণনা করতে গিয়ে মহর্ষি পতঞ্জলি অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ (দান গ্রহণ না করা) ইত্যাদি গুণগুলির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

বিজ্ঞানভিত্তিক জিজ্ঞাসার পরিপুষ্টি : উপনিষদের যুগে জিজ্ঞাসার ওপর জোর দেওয়া হত। আত্মজিজ্ঞাসু ঋষিগণ আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতোই প্রশ্ন করতেন, 'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'—কোন বস্তুকে জানলে সবকিছুর জ্ঞান লাভ করা যায়? তাঁদের প্রশ্ন মূলানুগ। এই জিজ্ঞাসা তাঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। উপনিষদের একটি উদাহরণ: শ্বেতকেতুকে তাঁর পিতা উদ্দালক আরুণি একটি ন্যগ্রোধফল এনে ভাঙতে আদেশ করলেন। পুত্র দেখলেন ফলের ভিতর অণুর মতো ছোটো ছোটো বীজ। পিতা সেই বীজ ভেঙে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন তার মধ্যে কী আছে। শ্বেতকেতু উত্তর দিলেন, 'ন কিঞ্চন ভগব'—আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ঋষি এভাবে বোঝালেন—কিছু দেখা না গেলেও সেই সূক্ষ্ম শক্তিই অতবড়ো ন্যগ্রোধবৃক্ষ সৃষ্টি করেছে। সূক্ষ্মশক্তিই এই বিশ্বপ্রপঞ্চের স্থূলবস্তুর কারণ।

উপনিষদের আচার্যেরা ছিলেন নির্লিপ্ত, বিজ্ঞানমনস্ক এবং সাহসী। বেদের প্রতি অত্যুচ্চ মর্যাদা প্রদর্শন করেও তাঁরা সেই পবিত্র শাস্ত্রকে সাধারণ বিদ্যার শ্রেণিভুক্ত করতে দ্বিধা করেননি। উপনিষদের ঋষিদের মননে আমরা প্রচণ্ড সাহস এবং মুক্তচিন্তা দেখতে পাই। সত্যের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা এবং বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্তিই এর কারণ। এই সাহস ও বিজ্ঞানমনস্কতা অন্যান্য ধর্মে দেখা যায় না। যেকোনও ধর্মে ধর্মগ্রন্থের স্থান সর্বোচ্চ। ঋষিগণ কিন্তু বেদকে 'অপরা বিদ্যা' বলেছেন, 'বেদো অবেদো ভবতি' বলে ঘোষণা করেছেন। সত্যদ্রষ্টা মুক্তপুরুষের কাছে বেদ অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন—'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন' (২।৪৫)—হে অর্জুন, শাস্ত্রাদি তিনটি গুণের আলোচনা করে, কিন্তু তুমি সেই তিনগুণকে অতিক্রম করো। যদি সত্যি বিজ্ঞানসম্মত আধ্যাত্মিকতার গবেষণা করতে হয়, তবে আমাদের শাস্ত্রের 'করো' এবং 'কোরো

না' এই প্রাথমিক নিয়মকে অতিক্রম করতে হবে। এই বিজ্ঞানসম্মত আধ্যাত্মিকতার আধুনিক ও শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।

যজ্ঞভাবনা: বৈদিক যুগ যজ্ঞের যুগ। সৃষ্টির মহত্তম যজ্ঞে সমনস্ক অংশগ্রহণের গুরুত্ব ছাত্রদের বোঝানো হত। সমাজের পরিকাঠামো ত্যাগ ও সেবার ওপর নির্ভর করে, শোষণ ও স্বার্থবুদ্ধির ওপর নয়। পতঞ্জলি তাঁর মূল্যবোধ পদ্ধতির নাম দিয়েছেন 'সার্বভৌম মহাব্রতম্' অর্থাৎ সকলের প্রতি ত্যাগ ও সেবাভাবের ব্রত। এই ব্রতের অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি যজ্ঞ। মানবমাত্রেরই এই পঞ্চমহাযজ্ঞ বাধ্যতামূলক : নৃযজ্ঞ—মানবের প্রতি কর্তব্য, ভূতযজ্ঞ—অন্যান্য প্রাণিদের প্রতি কর্তব্য, দেবযজ্ঞ—দেবতাদের প্রতি কর্তব্য, ঋষিযজ্ঞ—ঋষিদের প্রতি কর্তব্য এবং পিতৃযজ্ঞ—পূর্বপুরুষদের প্রতি কর্তব্য। এই পুরাতন ভাবনাই আজ পরিবেশ রক্ষণ, জীবনচক্র, সংরক্ষণ, পারস্পরিক নির্ভরতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেখা যায়। স্বামীজী ওই ভাবনাগুলিরই আধুনিক রূপান্তর করেছেন 'সেবাযজ্ঞে'র ভাবনায়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য : প্রাচীন শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার যথার্থ ভাবটি হৃদয়ংগম করা ও তাকে জীবনে প্রতিফলিত করা (যাকে স্বামীজী বলেছেন 'being and becoming')—শুধুমাত্র তথ্য ও তত্ত্ব মুখস্থ করা নয়।

মানবমনের অধ্যয়ন আধুনিক বিজ্ঞানের একটি জটিল ও বহু আলোচিত শ্রেণি। ভারতে বহিঃপ্রকৃতির গবেষণা 'অপরা বিদ্যা' হলেও মানবমনের গবেষণা 'পরা বিদ্যা'র অন্তর্ভুক্ত ছিল। বার্ট্রান্ড রাসেল নাস্তিক হলেও পরা বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সুন্দরভাবে বলেছেন—''যদি বিদ্যার তুলনায় মানবের জ্ঞানবৃদ্ধি না হয়, অতিরিক্ত বিদ্যা অতিরিক্ত দুঃখেই পরিণত হবে।'' ছান্দোগ্য উপনিষদে এর দৃষ্টান্ত পাই। ঋষি সনৎ-কুমারের কাছে নারদ এসে জানালেন যে, সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হয়েও তিনি দুঃখকে অতিক্রম করতে পারেননি। সনৎকুমার তাঁকে বোঝালেন—শুধুমাত্র বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান পরাজ্ঞান বা আনন্দ দিতে পারে না। তা লাভ করার জন্য আত্মসংযম এবং আত্মশাসন চাই।

আমরা ভুল করি এই ভেবে যে, বিজ্ঞানী বা চিকিৎসক হওয়ার জন্য চরিত্রগঠনের প্রয়োজন নেই। দুশ্চরিত্র ব্যক্তির অধিগত বিদ্যা অমঙ্গলের হেতু হয়। সেজন্য স্বামীজী বলেছেন যে শিক্ষার পরিসমাপ্তি হবে মানবগঠনে। দরকার ভারতীয় মনের বৈশিষ্ট্য—সেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গি ও সত্যের প্রতি সর্বগ্রাসী প্রগাঢ় ভালোবাসার পুনরুজ্জীবন এবং ব্যবহারিক জীবনে সাধনের দ্বারা মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের উপলব্ধিতে তার পরিসমাপ্তি। 'আমার মধ্যে আত্মা বিদ্যমান'—এই চিন্তা হল জ্ঞান; কিন্তু 'আমিই আত্মা' এইটি হল উপলব্ধি। এই অপরোক্ষানুভূতির পরে জ্ঞান স্বামীজীর বর্ণনায় 'being and becoming'-এ পরিণত হয়। এটিই পরা বিদ্যা।

শিক্ষার ফল

একত্ব: পরাজ্ঞান বহুত্বের মধ্যে একত্বের দিকে নিয়ে যায়। সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক উক্তি 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—সত্য এক, দ্রষ্টারা তাঁকে 'অনেক' বলে থাকেন। জগতের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে এই একত্বের স্বীকারোক্তি প্রয়োজন। এই একটি মহান সত্য বহু শতাব্দী ধরে বহু বিপরীত ও বিচিত্র চিন্তার সমন্বয় করে ভারতকে ধরে থাকতে সক্ষম হয়েছে। এই একত্বের অনুভূতি ভারতের অন্তরে প্রবিষ্ট বলেই নানা ভাষা, সংস্কৃতি, চিন্তাধারার সংঘাতেও ভারতবাসী তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে পেরেছে। যথার্থ শিক্ষার ফল হল সহিষ্ণুতা, ভালোবাসা, স্বীকৃতি।

যুক্তিনিষ্ঠতা : যথার্থ শিক্ষার ফলে প্রাচীন ভারতে একটি অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ মন গড়ে উঠেছিল যা সৃষ্টির সব ঘটনার পিছনেই কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে বার করতে চেয়েছিল এবং সফলও হয়েছিল। সেই মন আবিষ্কার করেছিল 'ঋত'কে।

চেতনা : আজ বিশ্ববিখ্যাত কোয়ান্টামতত্ত্ব চমকপ্রদ বহু আবিষ্কার করেছে। কোয়ান্টামতত্ত্ব প্রায় চেতনার দ্বারে এসে তার সমস্যার উত্তর খোঁজে। পার্থিব জগতের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা এই বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। সেই

চেষ্টায় দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টব্য বিষয়ের ভেদ চলে গিয়ে সব একাকার হয়ে যায়। তাই এখন বিজ্ঞানী ঘটনার সাক্ষী শুধু নন, তিনি অংশীদার। শ্রোয়েডিংগার বলেছেন, ''বিষয়বস্তু এবং জ্ঞাতা (মন) আসলে এক। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে ওদের মধ্যে ভেদরেখা ভেঙে গেল এমন কথা আজ আর বলা যাবে না। কেন-না ওদের কোনও ভেদ ছিলই না।'' এই সত্যটি ঋষিরা চার হাজার বছরেরও আগে আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরাও চৈতন্যের প্রবেশপথে এসে সমস্ত বিশ্বকে চৈতন্যময় বলে ঘোষণা করেছিলেন। অদ্বিতীয়ত্ব এবং ঐক্য তাঁদের নীতিবাক্য ছিল।

সামগ্রিক প্রপঞ্চতত্ত্ব : অসংখ্য প্রাণী পরস্পর-নির্ভরশীল হয়ে পৃথিবীতে বাস করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক স্বীকার করেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একটি ক্ষুদ্র অণুকোষের কার্যপদ্ধতিতেই কাজ করে। উপনিষদ বহুযুগ আগেই ঘোষণা করেছেন : 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' (মহানারায়ণোপনিষদ)। সেই ভিত্তিতে ভারতীয় আচার্যগণ 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—সমগ্র বিশ্বকে একটি বৃহৎ পরিবারে পরিণত করবার আদর্শ প্রবর্তন করেন। সমষ্টি রয়েছে ব্যষ্টিরই মধ্যে, আমার মধ্যেই সমগ্র বিশ্ব, অণুব্রহ্মাণ্ডেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিফলিত—এই তত্ত্বটি ধরা পড়েছিল উপনিষদের ঋষির প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে সম্পূর্ণ শিক্ষা

ড. রাধাকৃষ্ণন বলেছিলেন, ''খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ শতাব্দীতেই ভারত স্বীকার করেছে যে মানবপ্রকৃতির দেবত্বের পরিপূর্ণতা মানবজীবনের মূল লক্ষ্য। আমাদের ধর্ম কোনও বিষয়কে অন্ধবিশ্বাসে স্বীকার করতে শেখায়নি। বিজ্ঞানমনস্কতা আজকের ধর্মের মূলভিত্তি। সেখানে অহংকার বা যুক্তিহীন মতবাদ থাকে না।'' আমাদের পূর্বপুরুষেরা যদিও অন্ধ অনুকরণ পছন্দ করতেন না, তবু তাঁরা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিশ্বাসী থেকেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে আসেননি। 'রাধাকৃষ্ণন কমিশন'-এর পক্ষে ১৯৪৯ সালে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চরিত্র এবং মনের শক্তি বাড়ানোর জন্য উচ্চশ্রেণিতে কিছু আধ্যাত্মিক সাধন যেমন ধ্যান ইত্যাদি প্রবর্তনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তা কার্যকরী হয়নি।

স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র দেশের ইতিহাস অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে যথার্থ শিক্ষার দ্বারা নারী এবং জনসাধারণের উন্নতি না হলে ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারই থাকবে। তাঁর মতে জাতির সব সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব। যেধরনের শিক্ষা ভারতে দেওয়া হবে তারও একটি রূপরেখা তাঁর মনে পরিস্ফুট ছিল। তিনি বলেছেন, ''আমাদের চাই বেদান্তের সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা। আমাদের আদর্শ হবে ব্রহ্মচর্য এবং তার সঙ্গে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।''

স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন ১ মে, ১৮৯৭। তিনি এমন একটি মেশিন চালু করে যেতে চেয়েছিলেন যা ঘরে ঘরে উন্নত চিন্তা পৌঁছে দেবে। এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। ভারতের ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের শক্তিকে একত্র করে একটি 'শিক্ষা-সেনাবাহিনী' সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষার সামগ্রিক রূপ ছিল প্রাচীন যোগ ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়—প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সর্বোচ্চ চিন্তার সমন্বয়।

তাত্ত্বিকভাবে বলতে গেলে, বেদান্তের তত্ত্বকে বিজ্ঞানের যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তার সঙ্গে একত্র করতে হবে। দুইয়ের মধ্যে গভীর সমন্বয়ের সূত্র পাওয়া যাবে কেন-না বেদান্ত হল আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান। ব্যবহারিক দিক থেকে ধর্ম এবং বিজ্ঞানকে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠতে হবে। যেভাবে বিজ্ঞান জাগতিক সমস্যার সমাধান করে, ঠিক সেইভাবে আত্মবিজ্ঞানের মাধ্যমে মানসিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। একেই স্বামীজী 'ব্যবহারিক বেদান্ত' বলেছেন।

সামাজিক স্তরে, এই পরিপূর্ণ শিক্ষা একদিকে মানবকে নৈতিকজীবন যাপন করতে এবং অপরদিকে আর্ত-পীড়িত মানবসমাজের সেবা করতে সাহায্য করবে।